OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 49
Website: https://tirj.org.in, Page No. 426 - 433
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 426 - 433
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

ইতিহাসের অস্তাচলে নিমতিতা রাজবাড়ি ও কাশিম বাজারের পাতালেশ্বর মন্দির : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

নম্রতা দত্ত
মুক্ত গবেষক, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
Email ID : nupurdutta00869@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Sadabrata, Annakut, Hindu Theater, Alamgir, Gobindaji, Alkap, Football, Freedom, Burning of Sati,

Abstract
Murshidabad, a district of the majority of Muslims, is a meeting place of different religions and cultures. Hazarduari, Jahankosha, Bacchawali Kaman, Imambara, Nashipur Rajbari, Pareshnath Temple etc. located in the Lalbagh area of this district on the banks of the Bhagirathi River are very attractive to tourists, students, various schools, colleges, universities. The administration is very conscious to keep all these buildings alive. The only exceptions are Nimtita Rajbari in Jangipur subdivision of Murshidabad and Pataleshwar temple in Cossimbazar. Nimtita Rajbari built by Gour Sundar Chowdhury and Dwarkanath Chowdhury. This palace is built in Greek style which is a mixture of religion, culture, entertainment, sports and aristrocracy. A wonderful combination of East and West takes place in this palace. Different royal houses traditionally observe certain rules. Such as free sex, alienation, illegitimate children, baiji dance, drinking, tobacco consumption, gambling diplomacy, selfishness, jealousy, secret enmity, murder. The exception is this Nimtita Rajbari. Instead of walking on this path, they have taken a completely path. Which has set an example in front of all the other royal houses, in front of the society. Instead of walking on this path, they have taken a completely different path. Which has set an example in front of all the other royal houses, in front of the society. Renowned Principal of drama, Sisir Kumar Bhaduri, Satyajit Ray, his wife Bijoya Ray, sons Sandip Ray, Sharmila Tagore, Soumitra Chatterjee, Tulsi Lahiri, New Zealand's famous photographer Brian Brake once fell in this house. Everyone was impressed by the hospitality of the members and members of the Nimtita royal family. During the Durga Utsav of the Rajbari, the horizon was filled with the sound of 100 drums. But due to the wrath of the time cycle and the negligence of the people, the Nimtita Rajbari, which has thousands of memories, is standing on the road today as a huge building of skeleton. It is counting the time to be completely wiped out. On the other hand, the century-old Pataleshwar Shiva Temple in Raninagar of Bhatpara in Kashimbazar is very close to Baharampur, the heart of Murshidabad. This temple is associated with the plan to build Maharaja Jahajghata of Cossimbazar, the horrific form of Sati in the district, riots, Tantric Ravi Thakur single-handedly suppressing miscreants, the story of

Rammohan Roy's anti-Sati movement. But unfortunately for the people of the district, the Pataleshwar Shiva temple in Cossimbazar is being used only as a place of pilgrimage. Historical significance is not being presented to society. As a result, the unique history of this temple is being immersed in the water of Katiganga. Local people, devotees, local Marwari businessmen provide the necessary funds for the maintenance of this temple.The fact that this century-old Pataleshwar Shiva temple is different from the other five Shiva temples is not being portrayed in the right way. As a result, it is seen that due to lack of appropriate steps, the Nimtita Rajbari and the Pataleshwar temple of Cossimbazar, carrying a harmonious ideology, have gone to the deadlock of history.

Discussion

পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক জেলা মুর্শিদাবাদ। মুর্শিদাবাদের উপর দিয়ে প্রভাবিত ভাগীরথী নদী পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের সীমারেখাকে নিদিষ্ট করেছে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ মুর্শিদাবাদ হিন্দু-ইসলাম-খ্রিস্টান-বৌদ্ধ-জৈন প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মাম্বলম্বী মানুষের মিলনক্ষেত্র। এই রাঢ় অঞ্চল মুর্শিদাবাদে বিভিন্ন উপজাতির অস্তিত্ব বর্তমান। এই বৈচিত্রময় মুর্শিদাবাদে বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন উৎসব সম্মিলিতভাবে সাড়ম্বরের সাথে পালন করা হয়। বৈচিত্রময় ভারতবর্ষের একতার প্রতিকৃতি মুর্শিদাবাদ। অর্থাৎ জনসাধারণ ভারতের প্রতিটি কোনায় স্ব-শরীরে উপস্থিত না হতে পারলেও মুর্শিদাবাদে এলে বৈচিত্রময় একতার স্বাদ অনেকখানি নিতে সক্ষম হবে। এককথায় সকল মানুষের মহামিলন ক্ষেত্র এই মুর্শিদাবাদ। কৃষিপ্রধান এই জেলার নাম উচ্চারণ করলেই অক্সফোর্ড আদলে তৈরী সুবিখ্যাত শিক্ষাঙ্গন বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ, হাজারদুয়ারির মত গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনকেন্দ্র, লালবাগের বেড়া উৎসব, সত্যপীর, কাঁসা শিল্প, রেশম শিল্প, বিড়ি শিল্পের মতো গুরুত্বপূর্ণ অর্থকারী শিল্প, আলকাপের মত লোকনাট্য, লোককথার কথা উচ্চারিত হয়। কিন্তু এসবের মাঝেই এই জেলার সমন্বয়ী ভাবধারা বহনকারী নিমতিতা রাজবাড়ি ও প্রাসঙ্গিক তথ্য বহনকারী কাশিমবাজারের পাতালেশ্বর মন্দির নিয়ে আলোচনা তেমন হয়নি বললেই চলে। ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক অবহেলার অন্ধকারে অন্ধকারে নিমজ্জিত। আজকের আলোচনার মধ্য দিয়ে এই অনালোকিত দিকটিতে আলো ফেলে তাদের জীর্ণাবস্থা থেকে মুক্ত করে জৌলুসপূর্ণ করার চেষ্টা করা হবে।

আলোচনার শুরুতেই মুর্শিদাবাদ জেলার সামান্য পরিচিত অবশ্যক। কেননা অনেক সময়েই কোনো অপরিচিত কিংবা স্বল্প পরিচিত ব্যক্তিবিশেষের বহিঃবারণ অর্থাৎ পোশাক-পরিচ্ছেদ দেখে তাঁর অন্তর্নিহিত জ্ঞান, নম্রতা, ঐতিহ্য সম্পর্কে ভুল ধারণা জন্মায়। সেই ধারণার উপর সেই মানুষের প্রতি অপরজনের আচার-ব্যবহার প্রতিফলিত করে। তেমনি এই ঘটনা কোনো জেলার ক্ষেত্রেও হতে পারে। মুর্শিদাবাদও এর ব্যতিক্রম নয়। বেশিরভাগ জনমানসের নিকট মুর্শিদাবাদ মানেই শুরু থেকেই অশিক্ষিত, অমার্জিত, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় জর্জ্বরিত আর্থিকভাবে হত-দরিদ্র, অপসংস্কৃতির আখড়া, চূড়ান্ত বিশৃঙ্খল এক জেলা। জেলার এরূপ চিত্র দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এই উৎশৃঙ্খল জেলায় কৃষ্ণনাথ কলেজ-এর মত মহাবিদ্যালয় কিংবা হাজারদুয়ারির মত ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য রয়েছে এই ঢের। এই জেলাকে ক্ষেত্র বিশেষে কখন করুণার চোখে ও কখনও বলা ভালো বেশিরভাগ সময়েই তাচ্ছিল্যের সাথে দেখা হয়। কিন্তু গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যায় এর শিকড় অনেক গভীরে। মুর্শিদাবাদ এমন এক জেলা যেখানে ইন্দোচিনীয় রাজবংশীদের উত্তরপুরুষদের অস্তিত্ব থেকে ফারাক্কায় ফিডাল ক্যানেল খোঁড়ার সময় গুমানী ও ভাগীরথীর সংযোগ স্থলে প্রায় চার হাজার বছরের আদি সভ্যতার উপস্থিতির প্রমাণ মেলে।[১] এছাড়া গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্ত দ্বারা মুর্শিদাবাদের গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্তি, সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তর আমলে কর্ণসুবর্ণের প্রতিষ্ঠা, যেখানে সম্রাট অশোকের বৌদ্ধস্তুপ ও বিহারের উপস্থিতি, চীনা পর্যটক ই-সিং, ফাহিয়েন, গৌতম বুদ্ধর জেলাঞ্চলে আগমন, সনাতনী আন্দোলন অর্থাৎ বৈষ্ণব আন্দোলন, ব্রাহ্মণ্য আন্দোলনের ঝাপটা -এককথায় ইতিহাসের সর্বযুগে সর্ব গৌরবময় ক্ষেত্রেই এই মুর্শিদাবাদ জেলার নাম ওতপ্রোতঃভাবে জড়িত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য রাজবাড়ি কিংবা জমিদারবাড়ি সেই এলাকার আভিজাত্য, আর্থিক অবস্থাকে দর্শায়। বাংলার প্রাক্তন রাজধানী মুর্শিদাবাদ আর্থিকভাবে যে দুর্বল ছিল না তার জলন্ত প্রমাণ জঙ্গিপুর মহকুমার নিমতিতা রাজবাড়ি, সোনারুন্দি রাজবাড়ি, লালগোলার রাজবাড়ি, ভাবতার

রাজবাড়ি, সালারের চৌধুরি জমিদারবাড়ি, তালিবপুর রাজবাড়ি, লালবাগের নশিপুর রাজবাড়ি, জগৎ শেঠের বাড়ি, আজিমগঞ্জে রানীভবানীর রাজবাড়ি, বেলডাঙ্গার মোল্লা জমিদারবাড়ি, বেলডাঙ্গার জোতদার পরিবার, কান্দির সিংহ পরিবারের রাজবাড়ি জেমো রাজবাড়ি, বাঘডাঙ্গা রাজবাড়ি, ধুলিয়ানের জগতবন্ধু রায়ের জমিদারবাড়ি, ডোমকলের ভরতপুরের রাজবাড়ি, সৈদাবাদের কুঞ্জঘাটা রাজবাড়ি, জজানের রাজবাড়ি, খাগড়ার সেন পরিবারের মত নানা ছোটবড় রাজবাড়ি মুর্শিদাবাদের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে রয়েছে। কেনোনা জেলা যদি আর্থিকভাবে দুর্বল হত এত সমস্ত রাজবাড়ি, রাজপরিবারের উদ্ভব হত না। সেই সাথে বহরমপুর নতুনবাজারের জয়মঙ্গলা কালীবাড়ি, খাগড়ার পাতালকালী, জগদম্বা মন্দির, জিয়াগঞ্জের আমাইপাড়া কালীবাড়ি, খাগড়ার পঞ্চমুখী বটেশ্বর বাবার মন্দির, কাশিমবাজারের দশাবতার শিবমন্দির, পাতালেশ্বর শিবমন্দির, জজানের শিবমন্দির প্রভৃতি নানা শাক্ত মন্দিররের অস্তিত্ব জেলার বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ মেলে। তবে আজকের আলোচনার প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে নিমতিতা রাজবাড়ি ও কাশিমবাজারের পাতালেশ্বর মন্দিরকে।

নিমতিতা রাজবাড়ি : মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর মহকুমার অন্তর্গত সামশেরগঞ্জ-এর নিমতিতা গঙ্গার ভাঙন কবলিত এলাকা। এই নিমতিতার শেরপুর মৌজা এক প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকা। এই অঞ্চলেই আজ থেকে কয়েক দশক আগে প্রায় ১.২২ একর জমির উপর গৌড়সুন্দর চৌধুরী ও দ্বারকানাথ চৌধুরী কর্তৃক নির্মিত হয় নিমতিতা রাজবাড়ি। গ্রীক শৈলিতে নির্মিত নিমতিতা রাজবাড়ি বাহিরমহল ও অন্দরমহল এই দু'টি ভাগে বিভক্ত। একতলার কাছারি ঘরের ঠিক উপরে ছিল নয়নাভিরাম নানা রঙের চিত্রাঙ্কনে সজ্জিত সুবৃহৎ হলঘর, যা পেন্টিং হল নামে পরিচিত। ঘরটির কড়িবর্গা থেকে ঝুলত একাধিক ঝাড়বাতি, ছিল বেলজিয়াম কাঁচের বড় বড় আয়না, মেঝেতে ছিল পারস্যদেশীয় নকশাকাটা মহার্ঘ গালিচা বা কার্পেট।[২] লালবাগের হাজারদুয়ারীতেও এধরণের অমূল্য সম্পদের দেখা মেলে। প্রাঙ্গণের পশ্চিমে কাছারি বাড়ি ও উঃ-দঃ বারান্দার পাশে ছিল জমিদারি সংক্রান্ত নানা দপ্তর ও সাবেকিয়ানায় সজ্জিত প্রচুর কক্ষ। হাজারদুয়ারির মতো এই নিমতিতা রাজবাড়িতেও প্রচুর নকল দরজা বর্তমান। নিমতিতা রাজবাড়ির বাহিরমহলের সুবিস্তৃত উঠোনের পূর্বদিকে দোতলা সমান উচ্চতা বিশিষ্ট চণ্ডীমণ্ডপ ছিল, নিত্যসেবা হত কুলদেবতার। এই রাজবাড়ির রাজপুরোহিত জগতাইবাসী শ্রী রমেশচন্দ্র ভাদুড়ি মহাশয় কর্তৃক গৃহদেবতা 'শ্রীগোবিন্দজী'কে প্রতিদিন পঞ্চব্যঞ্জন ও নানাপদের মিষ্টান্ন সহকারে ভোগ নিবেদন করা হত। তাছাড়া এই রাজবাড়িতে সাধু-সন্ন্যাসীদের সেবার উদ্দেশ্যে পালিত 'সদাব্রত'। এরপর শুরু হত দুর্গোৎসব। রূপার ছাতা দিয়ে গঙ্গার থেকে ঘটের জল ভর্তি করে আনা হত।[৩] পূজায় বাজত ১০০টি ঢাক।[৪] নীলকণ্ঠ পাখি উড়িয়ে বিজয়া দশমী পালনের পর একাদশী তিথি থেকে একমাস ব্যপী পালিত হত কুলদেবতা 'গোবিন্দজী'-র সেবা উৎসব। এই গোবিন্দজী রাধাবিহীন। এই সময়ে নাটমঞ্চে বসত লীলাকীর্তন। গোবর্ধন যাত্রার দিন সাড়ম্বরে পালিত হত 'অন্নকূট উৎসব'। এর পাশাপাশি নিমতিতা রাজবাড়িতে অনুষ্ঠিত শিবজির পূজাকে কেন্দ্র করে প্রচুর ভক্ত সমাগম হত। এরপর বসন্তকাল জুড়ে মহাসমারহে চলত দোল উৎসব। তৎকালীন মুর্শিদাবাদবাসীর নিকট প্রধান আকর্ষণ এই দোল উৎসবকে কেন্দ্র করে বসত মেলা। যেখানে স্থানীয় আলকাপ দল আসত। বিভিন্ন উৎসব, পালা-পার্বণকে কেন্দ্র করে কাছারির বাড়ির উঠোনে বসানো হত যাত্রাগানের আসর। যাত্রাদলের কলাকুশলী ছিলেন স্থানীয় সুতি, জগতাই, দহরপাড়ার মানুষজন। যাত্রাদলে মহিলার পাঠ করতেন স্থানীয় সুদর্শন কিশোরের দল। 'হিন্দু থিয়েটার' কর্তৃক 'আলমগীর' নাটকের নিখুঁত উপস্থাপনা দেখে নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ি বিমোহিত হয়ে যান।[৫] মোটা অঙ্কের বিনিময়ে কলকাতা থেকে আসত যাত্রাদল। চিকের আড়াল থেকে বাড়ির মহিলারা যাত্রাপালার মধু আস্বাদন করতেন। যা এই প্রত্যন্ত এলাকাতেও সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলাদের মধ্যে পর্দাপ্রথার উপস্থিতির প্রমাণ দেয়। নিমতিতা রাজবাড়ির কাছারি প্রাঙ্গণে বিভিন্ন সময়ে কলকাতার 'আর্য অপেরা', 'ভোলানাথ অপেরা' যাত্রা উপস্থাপন করত। অতিথি হিসেবে থাকতেন শিশির কুমার ভাদুড়ি, ক্ষীরোদ প্রসাদ নিদ্যাবিনোদ, অপরেশ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। প্রসঙ্গত, ১৮৯৭ সালে মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী নিমতিতাতে 'হিন্দু থিয়েটার' এবং ৩০/৪০ফুট আয়তনের আটটি উইংস বিশিষ্ট 'নাটমঞ্চ' গড়েন।[৬] যেখানে নাটক মঞ্চস্থ করার সময় ডায়ানামোর সহায়তায় আলো জ্বালানো হত। এ সমস্ত নাট্যমঞ্চের দেওয়াল পূর্ণ হয় বিভিন্ন খ্যাতনামা শিল্পীদের পট চিত্রের দ্বারা। যা আজ বিলুপ্ত। তৎকালীন কাশিমবাজারের মহারাজার বানজেঠিয়া প্রদর্শনী, বুধসিংহ দুধোরিয়ার আজিমগঞ্জের আবাসস্থল ইত্যাদি নানা স্থানে নিমতিতার থিয়েটার নাট্য

মঞ্চস্থ করে সুখ্যাতি পায়।[৭] ১৯০২ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সন্তান জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরির বিবাহ উপলক্ষে কলকাতার স্টার থিয়েটার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'সাবিত্রী', গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা', বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে 'চন্দ্রশেখর' দীর্ঘ চাররাত্রিব্যপী মঞ্চস্থ করে নিমতিতা রাজবাড়িতে। থিয়েটার বাড়ির নিকটে ছিল ১৯০২ সালে নির্মিত রাজবাড়ির নিজস্ব ছাপাখানা 'গোবিন্দ প্রেস'।[৮] এর পূর্বদিকে ছিল রাজবাড়ির আস্তাবল ও হাতিশালা। যেখানে দ্রুত গতির ঘোড়ার পাল ও একটি বলশালী হাতি ছিল। প্রাসাদের পূর্বদিকে একটি পুকুর ও পাইক-বরকন্দাজদের থাকার জন্য আবাসস্থল। দক্ষিণ-পশ্চিমে হরিতকীসহ নানা মরশুমি ফলের বিশাল বাগান ছিল। শুধু তাই নয়। রাজপরিবারের লোকজনের মধ্যে খেলাধূলার প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। যার গুরুত্বপূর্ণ উদাহারণ— জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরি পিতা দ্বারকানাথ চৌধুরী স্মৃতিতে নিমতিতায় 'দ্বারকানাথ স্মৃতি শিল্ড' ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন।[৯] যেখানে কলকাতার নামী খেলোয়াড়রা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। সময় আর এগিয়ে আসলে দেখা যায় ভারত স্বাধীনতা লাভের পরেও এই রাজবাড়ির গৌরবময় ঘটনা ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছে। যার প্রকৃষ্ট উদাহারণ— ১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের 'দেবী' চলচ্চিত্রের চিত্র গ্রহণের কাজ শুরু হয়। ১৯৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে 'জলসাঘর' ও ১৯৬০ সালে 'তিনকন্যা' চলচ্চিত্রের চিত্রগ্রহণের কাজ হয়। এই তিন চলচ্চিত্রকে কেন্দ্র করে এই রাজবাড়িতে তৎকালীন সময়ে সত্যজিৎ রায়, তাঁর সহধর্মিণী বিজয়া রায়, পুত্র সন্দীপ রায়, শর্মিলা ঠাকুর, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, তুলসী লাহিড়ী, কালি সরকার, ছবি বিশ্বাসের মত স্বনামধন্য চিত্রপরিচালক ও তাঁর পরিবারসহ চিত্রতারকাদের আগমন ঘটে। শুধু তাই নয়, রাজ পরিবারের সদস্য-সদস্যাগণ আন্তরিকতার বিনিময়ে চিত্রগ্রহণের অনুমতি দেন। 'দেবী' চলচ্চিত্রের চিত্রগ্রহণের সময়ে চিত্রের স্বার্থে দ্বারকানাথ চৌধুরীর স্ত্রী শতদুবাসিনী চৌধুরী সিন্দুক থেকে নিজ মূল্যবান কানপাশা অভিনেত্রীকে ব্যবহারের জন্য দেন। আজকের সমাজে যেখানে মোটা অঙ্কের বিনিময়ে বিভিন্ন রাজবাড়ি-জমিদারবাড়িতে নানা ধরণের চিত্রগ্রহণ বা অনুষ্ঠান চলে, যেখানে সকল স্তরের মানুষ কমবেশি স্বার্থের বিনিময়ে কাজ করে সেখানে এধরনের স্বার্থবিহীন হৃদত্যা পাওয়া দুষ্কর। এমন কি নিউজিল্যান্ডের বিখ্যাত ফটোগ্রাফার ব্রায়ান ব্রেক-এর life Magazine-এর 'Moonsoon in India'-র জন্য নিমতিতা রাজবাড়িতে স্থিরচিত্র তোলেন অভিনেত্রী অপর্ণা সেন।[১০] তবে দুঃখের বিষয়, ১৯৪৩ সালে ভয়াবহ গঙ্গা ভাঙ্গনের সময় রাজবাড়ির আস্তাবল, খেলার মাঠ, প্রাঙ্গণকে গঙ্গা গ্রাস করে।[১১] ১৯৪৪ সালে রঙ্গালয়টি বন্যা কবলিত হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে।[১২] কিন্তু আবার দেখা যায়, ১৯২ কাঠার উপর নির্মিত এই রাজবাড়িতে ১৯৬৯ সালে ইন্দো-পাক্ যুদ্ধের সময় কমিশনের জরুরি বৈঠক বসে।[১৩] এই রাজবাড়িতে বিভিন্ন সময় পদধূলি পড়েছে লীলা রায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, দাদাঠাকুর, পুরাতত্ত্ববিদ্ ডেভিড ম্যাকাচ্চন মত বিদ্বজনদের।[১৪]

এতক্ষণ ধরে স্বল্প পরিসরে নিমতিতা রাজবাড়ির যে পরিচয় দেওয়া হল তার দ্বারা সহজেই উপলব্ধি করা সম্ভব যে এই রাজবাড়ির ইতিহাস আর পাঁচটা রাজবাড়ি থেকে আলাদা। বিশেষ করে যে সমস্ত রাজবাড়ি, প্রাসাদ- সরকারের, পর্যটকদের সু-নজরে রয়েছে তাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। যেমন— রাজবাড়ি, প্রাসাদ, মহল বা প্যালেস মানেই রাজনীতি, কূটনীতি, স্বার্থপরতা, হিংসা, গুপ্তশত্রুতা, হত্যা, অবাধ যৌনতা, পরকিয়া, অবৈধ সন্তান, বাইজি নৃত্য, মদ্যপান, তামাক সেবন, জুয়াখেলা ইত্যাদি। আবার রাজপরিবার মানেই গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজার রীতি থাকবেই। অর্থাৎ মারধর করে প্রজাদের থেকে কর স্বরূপ তোলাতুলে নিজেদের সিন্দুক বোঝাই করার পর তার নামমাত্র অংশ প্রজাদের দানধ্যান করে মহান সাজা। আবার রাজবাড়ি-রাজপরিবার মানেই বিনোদনের প্রধান মাধ্যম ছিল খ্যাতনামা বাইজি এনে নৃত্য পরিবেশনার নামে তাঁদের দেহরস নেওয়া। এসব দিক থেকে নিমতিতা রাজবাড়ি কোন দিক থেকে আলাদা? দেখা যায় গঠনশৈলি, আসবাবপত্রে পাশ্চাত্য ধারার ছোঁয়া লাগানো নিমতিতা রাজবাড়ি বিনোদনের জন্য বেছে নেয় বাংলার প্রাচীন লোকসংস্কৃতি-যাত্রাপালাকে। এই যাত্রাপালায় এলাকাবাসিদের কলাকুশলী হিসেবে নিয়োগ করে একদিকে গ্রাম্য মানুষগুলির কর্ম-সংস্থানের জোগাড় করে দেন। অন্যদিকে এ সমস্ত প্রান্তিক খেটে খাওয়া কম বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষগুলির সুপ্ত প্রতিভাকে জাগিয়ে আত্মবিশ্বাসী করে তোলেন এবং কলকাতার মত শহুরে মানুষদের কাছে জেলাবাসীর আত্মসম্মানকে শিখরে তুলে দেয়। নিমতিতা রাজপরিবার পয়সা খরচ করে নাট্যদল তৈরি করছে, যাত্রাপালা করছে তা সাধুবাদের দাবী রাখে। তাঁরা বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে বেছে নেয় ইংল্যান্ডে প্রচলিত ফুটবল খেলাকে। সেই খেলাকে কেন্দ্র করে আবার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা যায় তা সেই সময়ে

দাঁড়িয়ে ক'জনের মাথায় বা এই পরিকল্পনা আসতে পারে সেই বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। আবার বিভিন্ন পালাপার্বণ পালনের মধ্যে সাবেকিয়ানার পরিচয় দিয়ে নিমতিতা রাজবাড়ি প্রমাণ দেয় এই রাজপরিবার সংস্কারমূলক। কিন্তু রাজপ্রাসাদ নির্মাণেও যেমন পাশ্চাত্য চিন্তাধারা তথা আধুনিকতাকে আপন করে নিয়েছেন তেমনি নিজেদের মন-মানসিকতা আধুনিক চিন্তাধারার প্রতি আস্থা বিশ্বাস পোষণ করে এবং বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশিত করে প্রকৃত অর্থে অগ্রগতিশীল এক রাজপরিবারের পরিচয় দেন।

এবার আশা যাক আজকের নিমতিতা রাজবাড়ির চেহারা দর্শনে। নিমতিতা রাজবাড়ি সুদীর্ঘদিন বাবদ অবহেলায় থেকে আজ কঙ্কালাকার ভূতুরে জমিদার বাড়িতে পরিণত হয়েছে। রাজবাড়ির পাঁচটি উঠোন ও ১৫০টি ঘরের মধ্যে আজ কোনটি পুরোপুরি অক্ষত নেই। রাজবাড়ির বাইরের ও ভিতরের নানা অংশে সিমেন্ট খসে ইট বেরিয়ে রয়েছে। ফলে রাজবাড়ির ভূতপূর্ব রং কি ছিল তা অনুমান করা কঠিন। তার মধ্যে দেওয়ালে-স্তম্ভে লাগা অবস্থায় বহু ইটে ফাটল ধরেছে কিংবা ভেঙে গেছে, মূল দরজা জীর্ণ রাজবাড়ির বিভিন্ন অংশে মাথার উপর নেই ছাদ, এমনকি একতলা ও দ্বিতলের মধ্যবর্তি ছাদ বা মেঝেটি উধাও, কড়িকাঠে জন্ম নিয়েছে সবুজ আগাছা, যেখানে যতটুকু ছাদ বেঁচে রয়েছে তার অবস্থাও অত্যন্ত সংকটজনক। বাহিরমহল ও অন্তরমহলে একবাড়ি থেকে আরেকবাড়ি বা একমহল থেকে আরেকমহলে যাওয়ার জন্য ইটের তৈরী সেতুটি প্রায় ভগ্ন, শ্যাওলা ভর্তি, পরিত্যাক্ত। রাজবাড়ির ভিতরের অংশে দেখা যায় একেকটা উঠোনকে কেন্দ্র করে চারিদিকে ঘর নির্মিত হয়েছে। প্রায় পাঁচ বিঘা জমির উপর নির্মিত গোটা রাজবাড়িটির কঙ্কালাসাকার দেহটি এখনও গাম্ভীর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে উঁচু ভিত ও চওড়া পিলার উপর ভরসা করে। রাজবাড়ির ভিতরের এক উঠোনের একদিকে পড়ে থাকতে দেখা যায় শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষার দ্বারা অত্যাচারিত এক গাড়ির কঙ্কাল। যার দেহে পরিষ্কার করে কেবল বোঝা যায় কালো মোটা চাকা বাকি অংশ লোহা ভাঙার রূপ নিয়েছে। খুব কষ্ট করে পড়লে বোঝা যায় গাড়িটি আমেরিকায় নির্মিত। কোনো এক বিবাহ অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করে কবি কাজী নজরুল ইসলামকে এই গাড়িতে করে আনা হয়।[১৫] এই গাড়ি প্রায় ১২ বছর আগে অক্ষত থাকলেও সংরক্ষণের অভাবে সেটি আজ প্রায় কবরস্থ হওয়ার পথে। যেমন রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে রাজবাড়ির মাথার উপর ছাদ উপরে ওঠার সিঁড়ি উঠোন ও ছাদের মাঝখানের লোহার জাল নিশ্চিহ্ন। রাজবাড়ির মূল্যবান দুস্প্রাপ্য দেওয়াল চিত্র যেগুলি প্রকৃত অর্থে দেওয়ালের গায়ে অঙ্কন করা হয় সেগুলিও ফাঁকা ছাদের থেকে জল পড়ে, বাইরের হওয়া, ধুলোবালিতে নষ্ট হয়ে গেছে। নিমতিতা রাজবাড়ির বহু মুল্যবান আসবাবপত্র শরিকরা নিয়ে যায়, কিছুটা নিলাম হয়, কিছুটা চুরি হয়ে যায়। অর্থাৎ রাজবাড়িতে কোনো আসবাবপত্র নেই বললেই চলে। এমনকি জানলার মোটামোটা লোহার শিক্ চুরি হয়ে গেছে। ২০১৩ সালে গোবিন্দজীর কষ্টিপাথরের মূর্তি দুষ্কৃতিদের দ্বারা চুড়ি হয়ে যায়।[১৬] বাড়ির বিভিন্ন অংশে বড়বড় শিকড় বিশিষ্ট গাছের অস্তিত্ব দেখা যায়। যেগুলির উৎপত্তি মাটি থেকে নয়, রাজবাড়ির কোনো দেওয়াল বা বেঁচে থাকা ছাদের অংশ থেকে এদের জন্ম। রাজবাড়ির অন্দরমহলের দুর্গামণ্ডপটি সংস্কারের ফলে অক্ষতাবস্থায় জৌলুস নিয়ে বেঁচে আছে। প্রতিবছর দুর্গাপুজার সময় সর্বসাধারণের প্রবেশের জন্য খোলা হয়। ঠিক যেমন প্রাচীন আমলে কোনো বিশেষ পালাপার্বণে নাটমণ্ডপ প্রজাসাধারণের জন্য বিত্তশালীগণ উন্মুক্ত করতেন। যাতে গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণ রাজবাড়ির পার্বণের আনন্দে মাতোয়ারা হতে পারে। পুজার এই কয়েকটি দিন দেবীকে বিভিন্ন ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্ন সহকারে লুচির ভোগ দেওয়া হয়, অন্নভোগ দেওয়া হয় না। সেকালে ও এখনও বছরের অন্যান্য সময়ে দেবতার ভোগগ্রহণের সৌভাগ্য রাজপরিবারের সদস্যদের জন্য নির্দিষ্ট হলেও বছরের এই বিশেষ দিনগুলিতে ভোগপ্রসাদ সাধারণের মধ্যে বিলি করা হয়। এই ধারা কাশিমবাজার ছোটরাজবাড়ির ক্ষেত্রেও এখনও দেখা যায়, এমনকি এখনও রাজপরিবারের সদস্য-সদস্যাগণ সাধারণের থেকে পৃথক থেকে রাজগাম্ভীর্য বজায় রাখতে চেষ্টা চালান। পার্থক্য একটাই সেকেলের প্রজারা পূজা অঙ্গনে হাজির হয়ে যে অবর্ণনীয় আনন্দলাভ করতেন তা যেন ইন্দ্রলোকের পারিজাত ফুল প্রাপ্তির সাথে তুলনীয়। তবে এখনকার জনগণ রাজপরিবারের পূজা অঙ্গনে হাজির হন বন্ধুদের সাথে সময় কাটাতে, পচ্ছন্দসই নিজস্বী তুলতে।

দুঃখের মধ্যে সুখের কথা, ২০২২ সালের ১৭ই মার্চ রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের OSD বাসুদেব মালিকের নেতৃত্বে ৩জন সদস্যদের নিয়ে এক প্রতিনিধি দল এই নিমতিতা রাজবাড়িতে সরজমিনে তদন্ত করতে আসে।[১৭] মুর্শিদাবাদ জেলা ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রের উদ্যোগে নিমতিতা রাজবাড়ি সংস্কার ও বাঁচিয়ে রাখতে বিভিন্ন জমিদার বাড়ি, বিভিন্ন

দফতর জেলা প্রশানের কাছে নিরন্তর চিঠিপত্র দিয়ে প্রচেষ্টায় চালিয়ে যাচ্ছে।[১৮] মুর্শিদাবাদ জেলা ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রের উদ্যোগে কয়েক বছর ধরে ঐতিহাসিক ভ্রমণ ও দীপাবলির দিন মোমবাতি জ্বালিয়ে এই কঙ্কালসাকার রাজবাড়ির জীর্ণ হাড়ে অস্থি-মজ্জা লাগানর চেষ্টা করছে। এলাকাবাসীর আক্ষেপ কম করে ১০ বছর আগে প্রশাসনের টনক নড়লে এই রাজবাড়ির ভুতুড়ে দশা হত না।

কাশিমবাজারের পাতালেশ্বর শিবমন্দির : বহরমপুর থেকে নাতিদীর্ঘ দূরে কাশিমবাজারে ভাটপাড়ার রানীনগরে শতাব্দী প্রাচীন পাতালেশ্বর শিবমন্দির অবস্থিত। ইতিহাসের পাতা অনুসারে, মহারাণী স্বর্ণময়ী তাঁর জীবদ্দশায় যে ১০৮টি শিবমন্দির নির্মাণ করেন তারমধ্যে একটি হল এই পাতালেশ্বর শিব মন্দির। এখানে শিবমূর্তি নয় বেশিরভাগ মন্দিরের মতই লিঙ্গাকারে পূজিত হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অনেকের মধ্যেই ধারণা দেখা যায়, শিবলিঙ্গ বলতে পুরুষাঙ্গর প্রতিকৃতিকেই পঞ্চামৃত দ্বারা পুজা করা হয়। এই ধারণাকে ঘিরে মুখরোচক হাসাহাসি, মিম বা টিপ্পনী চলে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে শিবলিঙ্গ প্রকৃতির প্রতীক, নবপ্রাণের প্রতীক। 'লিঙ্গম্'-এর সংস্কৃত অর্থ হল প্রতীক। শিবের নিরাকার ঐশ্বরিক শক্তির প্রতিমূর্তি হল শিবলিঙ্গ। যাইহোক, এই শিবমন্দিরের পিছনে পশ্চিমদিক দিয়ে বয়ে গেছে কাটিগঙ্গা যা মূল গঙ্গা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। যেখানে এক সময় কাশিমবাজারের মহারাজার জাহাজঘাটা বানানোর পরিকল্পনা করেন। ১৮০৩ সালে রাজা রামমোহন রায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনস্থ কর্মখাতিরে মুর্শিদাবাদে আসেন। এই সময়ে জেলার সতীদাহর ভয়াবহরূপ তাঁকে উদ্বেলিত করে। জানা যায়, ১৮১৮ সাল থেকে ১৮২৮ এই দশ বছরে মুর্শিদাবাদে প্রতি বছর গড়ে সতীদাহর ঘটনা ঘটে।[১৯] রামমোহন রায়ের আন্দোলনের চাপে পড়ে মুর্শিদাবাদে এই কুপ্রথা অনেকাংশে বন্ধ হয়। শোনা যায় রায়টের সময় তান্ত্রিক রবি ঠাকুর একা হাতে দুষ্কৃতিদের রামদা অথবা খড়গের দ্বারা হত্যা। ফলে এই কাটিগঙ্গার জল দুষ্কৃতিদের রক্তে লাল হয়ে যায়। এই রামদা বা খড়গ মন্দিরের কোনো এক গোপন কুঠুরিতে রক্ষা করা হয়। বিশেষ কোনো মানুষের বিশেষ অনুরোধে এই রামদা দেখানো হয়।[২০] বাকি সকল মানুষের চোখের আড়ালে এটি রয়েছে। প্রসঙ্গত, নামের দিক থেকে তান্ত্রিক রবি ঠাকুরের সাথে বিশ্বকবি রবি ঠাকুরকে গুলিয়ে ফেলেন। প্রকৃতপক্ষে রবি ঠাকুর নামে এক সাধক বহু বছর আগে ভাটপাড়ায় জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে মা কালীর সেবা ও তন্ত্র সাধনা করতেন। পাতালেশ্বর মন্দির সংলগ্ন কৃপাময়ী কালিবাড়ি তারই নির্মিত, মন্দিরের আরেকটি শাখা নিকটেই রয়েছে। বর্তমানে তাঁর বংশধররা দুই কৃপাময়ীরই সেবাইত। যাইহোক স্থানীয় সূত্রে মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ভিন্ন কাহিনী শোনা যায়। আজকের সময়ে যেখানে পাতালেশ্বর শিবমন্দির রয়েছে, এক সময়ে সেই এলাকাটি জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। জনবসতি ছিল না বললেই চলে। শিবলিঙ্গটি কোনো এক গাছের নীচে অবহেলিত ছিল। পরবর্তীতে শিবলিঙ্গটি স্থানীয় লোকজনের চোখে পড়লে নিত্যপূজা শুরু হয়। ধীরে ধীরে শিবলিঙ্গটি স্থায়ী বসতি লাভ করে অর্থাৎ ছয়ফুট বারান্দা বিশিষ্ট টালির ছাউনি দেওয়া ঘরে শিবলিঙ্গটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ২০০৬ সালে এলাকাবাসীর উদ্যোগকে আজকের পাতালেশ্বর মন্দিরটির নবনির্মাণ রূপ ঘটে। বলা হয়, শিব এখানে স্বয়ম্ভূ। এই মন্দিরে প্রবেশের মুখে রয়েছে প্রায় ৪০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট শিবমূর্তি। বিশাল লোহার দরজা দু-পাশে নানারকম ফুলের বাগান ও নানা গাছ পেরিয়ে আসে শিব মন্দিরটি। মন্দিরের তিনদিকে বটগাছ ও বটের ঝুড়ির জন্য মন্দিরটির উপরের অংশ দূর থেকে ঠিক করে প্রায় দেখা যায় না। মাটি থেকে পাঁচটি মার্বেলের সিঁড়ি উঠে মূল মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। সমতল ছাদ বিশিষ্ট মন্দিরের মাথায় আপাতদৃষ্টিতে উল্টানো ওলোন আকৃতির শিখর যাতে বায়ু চলাচলের জন্য খিড়কি উপস্থিত। তার উপরে রয়েছে ত্রিরত্ন বিশিষ্ট চূড়া। শান্তির প্রতীক সাদা রঙ-এর এই মন্দিরের চারিপাশে খোলা বারান্দা এবং মধ্যখানে রয়েছে গর্ভগৃহ। আরও পাঁচটি সিঁড়ি ভেঙে মূল গর্ভগৃহে প্রবেশ করতে হয়। কেননা শিবলিঙ্গটি মাটি থেকে প্রায় ১০ ফুট নীচে রয়েছে। জ্যোতিলিঙ্গটি তামার পাত দিয়ে ঢাকা থাকে। ভক্তকুলের বিশ্বাস অনুসারে জ্যোর্তিলিঙ্গটি নাকি একটু একটু বৃদ্ধি পাচ্ছে, কেননা আগে নাকি অনেকখানি ঝুঁকে শিবলিঙ্গটি ছোঁয়া যেত এখন সহজেই নাগাল পাওয়া যায়। মন্দিরটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য এখানে ভগবান ও ভক্তের মধ্যে পুরোহিত আসে না বললেই চলে। ভক্তরা নিজ ইচ্ছামত পূজা দিয়ে সাধ্যমত দক্ষিণা দেন। এই দৃশ্য বিরল কেননা মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন প্রান্তসহ যেকোনো দেবস্থানে ভগবান ও ভক্তের মাঝে পুরোহিত দাঁড়িয়ে থাকে। কোনো কোনো দেবস্থানে ভক্তদের প্রত্যহ পূজার নিদিষ্ট দক্ষিণামূল্য নির্ধারণ করা হয়। প্রতি বছর শিবরাত্রির দিন ও পুরো

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 49
Website: https://tirj.org.in, Page No. 426 - 433
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

শ্রাবণ মাস জুড়ে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত, পাশ্ববর্তি নদীয়ার দেবগ্রাম, বেথুয়াডাহারি সহ নানা জেলা থেকে বহু ভক্তের সমাগম ঘটে। এই উপলক্ষে গোটা মন্দির চত্বর বিয়ে বাড়ির ন্যায় সেজে ওঠে, বারান্দায় বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত সন্ন্যাসীরা স্তোত্রপাঠ করেন, পূজার শেষদিন সুবিশাল নরনারায়ণ সেবার আয়োজন করা হয়। এই মন্দির রক্ষণাবেক্ষণ ও আনুষাঙ্গিক কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান দেন স্থানীয় মানুষ, ভক্তগণ, স্থানীয় মারোয়ারী ব্যবসায়ীরা। কিন্তু পরিতাপের বিষয় মনস্কামনা পূরণ হেতু এই মন্দিরে বহু লোকের আগমন ঘটলেও ইতিহাসের স্মৃতি বিজড়িত স্থান হিসেবে এর কোনো কদর নেই, নেই ইতিহাসকে তুলে ধরার কোনো স্বদিচ্ছা। সন্ধ্যা নামলেই সতীদাহ ঘাটে ছেলেদের নেশাদ্রব্য নিতে দেখা যায়, কাটিগঙ্গা রক্ষণাবেক্ষনের অভাবহেতু কচুরিপানায় ভর্তি হয়েছে, চারিপাশে জঙ্গল, ঘাট নেই বাঁধানো, নেই আলোর ব্যবস্থা। সেখানে বহরমপুরের প্রায় প্রতিটি গঙ্গার ঘাট প্রশাসনের তরফে বাধানো, সুসজ্জিত আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাটিগঙ্গা যেন চওড়া নালায় পরিণত হয়েছে।

সামগ্রিক আলোচনার শেষে বলা যায়, লালবাগের নশিপুর রাজবাড়ি, জগৎ শেঠের বাড়ি, কাশিমবাজারের ছোট রাজবাড়ি, কান্দির সিংহ পরিবারের রাজবাড়ি, সৈদাবাদের রাজবাড়ি মত বিভিন্ন ছোটবড় রাজবাড়ি নিয়মিত সংস্কার, আর্থিক সহায়তা লাভ করে তাদের রূপ-যৌবন অক্ষত রেখেছে। যেমন— বহরমপুরের বুকে সৈদাবাদের রাজবাড়ির একাংশে জনসাধারণের জন্য ব্যবহৃত গ্রন্থাগার, লালবাগের হাজারদুয়ারির পাশাপাশি নশিপুর রাজবাড়ির বাইরে হনুমান মন্দির থেকে শুরু করে অন্দরমহলে সুসজ্জিত ড্রয়িং রুম, অমূল্য নয়নাভিরাম দরবার ঘর, নাচমহলের স্বরূপ চারটি থামের উপস্থিতি, ফাঁসী ঘর, দেবী সিংহের পাজামা-সিংহাসন, দামী আসবাবপত্র, ফাঁসি দেওয়ার সময়ের কালো জামা, বিষ পরীক্ষা করার পাত্র, জগৎ শেঠের বাড়িতে সংরক্ষিত সোনার-রূপার কাজ করা বেনারসি শাড়ি, মসলিন শাড়ি, লক্ষ্মীর ঘর প্রভৃতি পর্যটকদের যেমন আকর্ষিত করে তেমনি এ সমস্ত স্থাপত্য-এলাকাগুলিতে সাংস্কৃতিক মনস্ক মানুষকে টেনে আনে। আবার বেশকিছু শিক্ষিত মানুষ গাইড হিসেবে কিছু মুখস্থবুলি আওরিয়ে সংসার চালাচ্ছে। কাশিমবাজারের ছোট রাজবাড়ির একাংশকে অতিথিশালা হিসেবে ব্যবহার, সামনের অংশে সিল্ক ও মিষ্টির বিপণকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার, ঠাকুরদালানে দুর্গাপুজার সময়ে রাজপরিবারের সদস্য-সদস্যাদের জনসম্মুখে আগমন, বিভিন্ন গনমাধ্যমের নিরন্তন প্রচার দৌলতে পর্যটকদের মৌমাছির চাকের মত আকর্ষিত করে। আবার এই সমস্ত সম্পর্কে বহু অজানা দিক তুলে আনতে অধ্যাপক, ইতিহাসবিদরা সহায়তা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নিমতিতা রাজবাড়ি পর্দার আড়ালে চলে গেছে। যদি এর কারণ হিসেবে নিমতিতা রাজবাড়ির অত্যন্ত প্রান্তিক এলাকায় অবস্থিতিকে দায়ী করা হয় তাহলে তা একেবারেই ভুল ধারণা। কেননা হাজারদুয়ারি, নশিপুর রাজবাড়ি, জগৎ শেঠের বাড়ি মুর্শিদাবাদের প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত। এমনকি অতি সাম্প্রতিক জিয়াগঞ্জের বড়নগর সেরা পর্যটন গ্রামের তকমা পেল কেন্দ্র সরকারের পর্যটন বিভাগের বিচারে। আবার জমিদারি বৈঠকখানা বহরমপুরের প্রাণকেন্দ্র নতুনবাজারে অবস্থিত হলেও বেশ কিছু বছর আগে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়েছে। বর্তমানে সেই এলাকার সামনের ভাগ ঘিরে বিভিন্ন বিপণী গড়ে উঠেছে ও ভিতরের এবড়ো-খেবড়ো মাটি আগাছাপূর্ণ গোচারণভূমিতে পরিণত হয়েছে। নিমতিতা রাজবাড়ির সামনে আগাছার মধ্যে প্রশাসনের বিজ্ঞপ্তি পড়ার সাথে সাথে রাজবাড়ির বর্তমান কঙ্কাল অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে প্রশাসনকে অতিদ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। সমন্বয়ী ভাবধারা বহনকারী নিমতিতা রাজবাড়ির অস্তাচলে গমন করতে খুব বেশি সময় নেবে না। তাছাড়া এই রাজবাড়িকে বাঁচিয়ে তুলতে পারলে ও যথাযথিচ প্রচার করতে পারলে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ লাভজনক পর্যটনকেন্দ্রে পরিণত হয়ে জেলার আর্থিক উন্নয়নের পাশাপাশি স্থানীয় হতদরিদ্রের পেটে ভরপেট ভাতের জোগান দিতে পারবে। রাজবাড়ির সংস্কারের সময় মিস্ত্রী হিসেবে স্থানীয় মিস্ত্রিদের কাজে লাগানো যাবে। রাজবাড়িটি নতুন রূপপেলে তাকে দেখতে পর্যটকরা যেমন আসবেন তেমনি তাদের আতিথেয়তার জন্য স্থানীয়রা ছোটবড় রেস্তারা, অতিথিনিবাস, পোশাক, মনিহারী দোকান দিতে পারবেন। টোটো চালকদের আয় বাড়বে। ধীরে ধীরে বাইরের ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করতে আসবেন। ফলে এলাকার ছেলেদের কাজের জন্য পরিয়ায়ী শ্রমিক হিসেবে ভিন রাজ্যে উড়ে যেতে হবে না, বাড়ির মেয়েদের লোকের বাড়িতে কাজ করতে হবে না। বরং নবরূপে রাজবাড়ি সজ্জিত হওয়ার সুবাদে বিভিন্ন ব্যবসা করে তাঁদের যে পসার হবে তা দিয়ে সন্তানদের ভালো স্কুলে লেখাপড়া করিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করতে পারবে। অর্থাৎ নিমতিতা রাজবাড়ি সংস্কারের উপর এই অঞ্চলের সামাজিক-আর্থিক-শিক্ষাগত অগ্রগতি অনেকাংশে নির্ভরশীল। পাশাপাশি

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 49
Website: https://tirj.org.in, Page No. 426 - 433
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভারতীয় ইতিহাসকে মজবুত করতে পারবে তার অতীত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি দিয়ে। সেই সাথে কাশিমবাজারের পাতালেশ্বর শিবমন্দিরকে শুধু তীর্থস্থান হিসেবে ব্যবহার না করে তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব সমাজের সামনে তুলে ধরতে হবে, ছাত্র সমাজ ও পর্যটকদের মধ্যে এর মূল্য তুলে ধরতে বিভিন্ন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, গণমাধ্যমগুলিকে নিঃস্বার্থভাবে এগিয়ে আসতে হবে। তবেই ঐতিহাসিক জেলা মুর্শিদাবাদের মুকুটে আরও দুটি অহংকারের পালক উঠবে।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, দে নন্দিনী, ঐতিহ্য ও লোকসংস্কৃতির সমন্বয়ে জেলা মুর্শিদাবাদ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৪০
২. রায়, অরিন্দম, মুর্শিদাবাদ অনুসন্ধান, পঞ্চম খণ্ড; প্রাচীন থেকে আধুনিক, মুর্শিদাবাদ জেলা ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র প্রকাশনা (সম্পাদিত), ২১ ফ্রেব্রুয়ারী ২০২১, পৃ. ১৭৮
৩. এই সময়, (অনলাইন), ৪ই জুন ২০২২
৪. তদেব
৫. দাস, কল্যাণ কুমার, মুর্শিদাবাদের বনেদি বাড়ি (সম্পাদিত), শিল্পনগরী প্রিন্টাস, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, ২০২১-২২, পৃ. ২১৬
৬. তদেব, পৃ. ২১৫
৭. আলোকপাত ঝড় সাহিত্যপত্র, জুন ২০১২, পৃ. ১১৬
৮. রায়, অরিন্দম, মুর্শিদাবাদ অনুসন্ধান, পঞ্চম খণ্ড; প্রাচীন থেকে আধুনিক, মুর্শিদাবাদ জেলা ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র প্রকাশনা (সম্পাদিত), ২১ ফ্রেব্রুয়ারী ২০২১, পৃ. ১৭৯
৯. তদেব, পৃ-২০৩
১০. রায়হান, জাহান, মুর্শিদাবাদ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২০, পৃ. ৮৪
১১. তদেব, পৃ. ৮৩
১২. তদেব, পৃ. ৮৩
১৩. আনন্দবাজার পত্রিকা (অনলাইন), ২৬শে ফ্রেব্রুয়ারী ২০২৩
১৪. ঝড় সাহিত্যপত্র, বিষয় : মুর্শিদাবাদ, সেপ্টেম্বর ২০০৪, পৃ. ৪৫৮
১৫. সাক্ষাৎকার : মণ্ডল স্বাধীন, স্থানীয় বাসিন্দা, বয়স- ৪৫, গ্রাম- নিমতিতা, থানা- জঙ্গিপুর , জেলা মুর্শিদাবাদ, ২০/০৬/২০২৩
১৬. রায় অরিন্দম, মুর্শিদাবাদ অনুসন্ধান, পঞ্চম খণ্ড; প্রাচীন থেকে আধুনিক, মুর্শিদাবাদ জেলা ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র প্রকাশনা (সম্পাদিত), ২১ ফ্রেব্রুয়ারী ২০২১, পৃ. ২১০
১৭. আনন্দবাজার পত্রিকা (অনলাইন), ৮ই জুন ২০২৩
১৮. তদেব
১৯. দাস রবীন্দ্রনাথ, মুর্শিদাবাদ অনন্য মুর্শিদাবাদ, রোহিণী নন্দন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ১০৭
২০. সাক্ষাৎকার : বসাক কস্তুরি, বয়স- ৫৬, থানা : খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, ১২/০৬/২০২৪